বৃত্তি পরীক্ষায় কিন্ডারগার্টেন বাদ কেন?

আরিফ আনজুম

: রোববার, ২৭ জুলাই ২০২৫

বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার এক আলোচিত ও ব্যাপক প্রসারিত একটি অংশের নাম কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। সব কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের বাদ দিয়ে শুধু সরকারি সুবিধাভোগী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে জাতীয় পর্যায়ে মূল্যায়নপদ্ধতি তথা প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা নেয়া একধরনের জাতীয় আত্মঘাতী স্বিদ্ধান্ত হবে। দেশের বর্তমান বৈষম্যবিরোধী ক্ষমতাসীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের শিক্ষা ব্যবস্থাপনায় শিশুশিক্ষার্থীদের প্রতি এই ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ করা কখনও কাম্য হতে পারে না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরবর্তীকালে জাতীয় পর্যায়ে পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত সব সরকারি প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা ও পরবর্তীতে অনুষ্ঠিত সমাপনী পরীক্ষায় বেসরকারি তথা কিন্ডারগার্টেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে এসেছে। কিন্তু কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার বাইরে রাখার সিদ্ধান্তে দেশজুড়ে উঠেছে সমালোচনার ঝড়। শিক্ষা সবার অধিকার হলেও এই বৈষম্যমূলক নীতিতে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে ‘সবার জন্য শিক্ষা’র অঙ্গীকার। এখনই সময় সরকারের চিন্তা ও সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার। কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার্থীদের বাদ দিয়ে বৃত্তি পরীক্ষা বৈষম্যকে আইনি রূপ দেবে বৃত্তি

পরীক্ষা থেকে কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার্থীরা বাদ পড়লে শিশুদের মেধা যাচাইয়ের মঞ্চ থেকে ছিটকে পড়বে হাজারো স্বপ্ন।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশনা অনুযায়ী, পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে কেবল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। দেশের হাজার হাজার সরকারি নিবন্ধিত কিন্ডারগার্টেন ও স্বীকৃত বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এই পরীক্ষার আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ইতোমধ্যেই দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবক মানববন্ধন এবং স্মারকলিপি দিয়েছেন। তাদের দাবি স্পষ্ট, শিক্ষার অধিকার সবার জন্য সমান হওয়া উচিত, কোনো শিশুকে তার প্রতিষ্ঠানের নাম বা শ্রেণী দিয়ে বঞ্চিত করা যাবে না। আমাদের দেশের কিন্ডারগার্টেনের লাখ লাখ শিশু বছরের পর বছর কঠোর পরিশ্রম ও অধ্যবসায় নিয়ে এই পরীক্ষায় অংশগ্রহণের স্বপ্ন দেখেছে। ২০০৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) পরীক্ষা চালু থাকাকালে বৃত্তি পরীক্ষা বন্ধ ছিল। ২০২২ সালে পুনরায় বৃত্তি পরীক্ষা চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়, যা এবার বাস্তবায়নের মুখে দাঁড়িয়েছে। অধিকাংশ কিন্ডারগার্টেন স্কুল নিবন্ধনপ্রাপ্ত, সরকারি নির্দেশনা মেনে চলছে। তাদের শিক্ষার্থীরা একই জাতীয় পাঠ্যক্রমে প্রস্তুতি নিচ্ছে, একই বই পড়ে। কিন্তু হঠাৎ করেই বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ থেকে বাদ দেয়া হয়। এটা শিক্ষার্থীদের নয়, তাদের মেধার প্রতি এক অন্যায়, আর তাদের অভিভাবকদের প্রতারণার অনুভূতি দেয়।

বাংলাদেশে কিন্ডারগার্টেন নামক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো মূলত অভিভাবকদের চাহিদা, সরকারি ব্যবস্থার ঘাটতি এবং কিছুটা মানসম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষার অভাবের কারণে বিকশিত হয়েছে। শহরাঞ্চলে অনেক পরিবারই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সন্তান পাঠাতে চান না নানা কারণে। শিক্ষকের স্বল্পতা, অবকাঠামোর দুরবস্থা তো আছেই, পাঠদানের মান নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। সেই জায়গা থেকে নানা রকম কেজি স্কুল গড়ে উঠেছে। অনেকেই নির্দিষ্ট কোনো সরকারি স্বীকৃতির আওতায় না থাকলেও, বাস্তবে তারা প্রাথমিক শিক্ষার অনেক বড় একটি অংশ জোগান দিচ্ছে। ২০২২ সালের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক তথ্যে দেখা যায়, দেশে আনুমানিক ৬০ হাজার কিন্ডারগার্টেন রয়েছে, যেখানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা

প্রায় ৪০ লাখ। এটি বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় একটি গুরুত্বপূর্ণ উপখাত। বাংলাদেশ কিন্ডারগার্টেন স্কুল অ্যান্ড কলেজ ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সভাপতির বক্তব্য অনুযায়ী, দেশে প্রায় এক কোটির বেশি শিক্ষার্থী এবং দশ লক্ষাধিক শিক্ষক সরাসরি কিন্ডারগার্টেন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত। দেশের এই কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার্থীদের বাদ দিয়ে কোনো ধরনের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা নেয়া হলে তা বৈষম্য ছাড়া কিছু নয়। এটি দেশের শিক্ষা কাঠামোর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হিসেবেও অভিহিত করেন। দেশের এই বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে উপেক্ষা করে নীতিনির্ধারকরা যদি এমন সিদ্ধান্তে অটল থাকেন, তাহলে তা শুধু শিক্ষাক্ষেত্রে নয়, বরং রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে বাধ্য হবে।

উল্লেখ্য প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিইসি) পরীক্ষা চালুর মাধ্যমে বৃত্তিপদ্ধতি বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। পরে আবারও বৃত্তি পরীক্ষা চালু করার উদ্যোগ নেয়া হলেও বাস্তবায়ন হয়নি। তবে মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য ‘মেধা বৃত্তি’ এবং দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য ‘উপবৃত্তি’ চালু থাকে। চলতি বছর নতুন করে বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ২১-২৪ ডিসেম্বর তারিখে। চারটি বিষয়ে- বাংলা, ইংরেজি, প্রাথমিক গণিত এবং বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় ও প্রাথমিক বিজ্ঞান (যেখানে শেষ দুটি বিষয় একত্রে ৫০ শতাংশ করে এক পত্রে) এই পরীক্ষা হবে বলে জানা গেছে। প্রশ্ন হচ্ছে, যখন কিন্ডারগার্টেনের লাখ লাখ শিক্ষার্থী বছরজুড়ে কঠোর পড়াশোনা ও প্রস্তুতির মধ্য দিয়ে বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আশায় এগিয়ে এসেছে, তখন হঠাৎ করে তাদের বাদ দেয়ার এমন সিদ্ধান্ত কতটা যুক্তিযুক্ত? বিশেষ করে যখন কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে কয়েক মাস আগেই সচিবালয়ে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা এবং সচিবের কাছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয় এবং তাদের পক্ষ থেকে অংশগ্রহণের আশ্বাসও দেয়া হয়। তখন সিদ্ধান্তে এই পরিবর্তন শুধু বিভ্রান্তিকর নয়, বরং প্রতারণার শামিল বলেই মনে করছেন অনেকেই।

এখানে আরও একটি মৌলিক বিষয় হলো ‘সবার জন্য শিক্ষা’ এই রাষ্ট্রীয় নীতি ও সংবিধানগত অঙ্গীকারের সঙ্গে এই সিদ্ধান্ত সরাসরি সাংঘর্ষিক। শিক্ষা শিশুদের মৌলিক অধিকার। সেই অধিকার থেকে কোনো শিশুকে বঞ্চিত করা রাষ্ট্রের দায়িত্বজ্ঞানহীনতারই বহিঃপ্রকাশ। বাস্তবতা হলো,

দেশের শিশুশিক্ষার্থীদের অর্ধেকের বেশি কিন্ডারগার্টেন বা বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত। সরকারি বিদ্যালয়ের সংখ্যাও প্রয়োজনের তুলনায় খুবই সীমিত। এমন বাস্তবতায় কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো মূলত সরকারের পরোক্ষ সাপোর্ট সিস্টেম হিসেবেই কাজ করছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলো না থাকলে কোটি শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন শুরু করা কঠিন হয়ে যেত। একইসঙ্গে কিন্ডারগার্টেন শিক্ষকরা উচ্চশিক্ষিত বেকার যুবকদের জন্য কর্মসংস্থানের এক বড় উৎস। এসব চিন্তা করলে সহজেই বোঝা যায়, কিন্ডারগার্টেন শুধু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়, বরং একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবকাঠামোও বটে।

বিভিন্ন সময়ে বলা হয় সরকার কিন্ডারগার্টেন বন্ধ করতে চায় না, অথচ বৃত্তি পরীক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি সুযোগ থেকে তাদের বঞ্চিত করতে যাচ্ছে, তখন সাধারণ শিক্ষার্থী-অভিভাবকের মধ্যে সন্দেহ দানা বাঁধে। এরকম পরিস্থিতিতে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো নীতিনির্ধারকদের মধ্যে সিদ্ধান্তের সমন্বয়হীনতা। সচিব ও উপদেষ্টা যখন কিন্ডারগার্টেন অ্যাসোসিয়েশনকে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের আশ্বাস দেন এবং দেড় মাস পরেই সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী সিদ্ধান্ত নেয়া হয়, তখন সেটিকে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গির দ্বৈততা বলেই মনে হয়। এটি সরকার ও সাধারণ মানুষের পারস্পরিক বিশ্বাসের সম্পর্কেও নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। এমনকি যেসব কিন্ডারগার্টেন ইতোমধ্যেই নিবন্ধনপ্রাপ্ত, তাদের ক্ষেত্রেও কোনো ব্যতিক্রম না রাখায় বিষয়টি আরও বিতর্কিত হয়েছে।

ইআইআইএন ধারী নন-এমপিও ভুক্ত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা এসএসসি পরীক্ষা দিতে পারে, তাহলে কেন নিবন্ধনপ্রাপ্ত কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার্থীরা বৃত্তি পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে না? ২০২৩ সালে সরকার নতুন করে শত শত কিন্ডারগার্টেনকে পাঠদানের অনুমতি দিয়েছে। তাহলে, তাদেরকে প্রাথমিক শিক্ষার বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ না দেয়া কি ন্যায়সঙ্গত? ১৯৭২ সালের সংবিধানে স্পষ্ট বলা হয়েছে, “শিক্ষা হবে সবার জন্য, সমান ও অন্তর্ভুক্তিমূলক।” বর্তমান সরকার নিজেকে বৈষম্যবিরোধী হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়। তবে চলতি বছরের বৃত্তি পরীক্ষায় কিন্ডারগার্টেন শিক্ষার্থীদের বঞ্চনা এই সংবিধানিক প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে যায়। শিক্ষা যদি প্রকৃত অর্থে মৌলিক অধিকার হয়,

তাহলে তার মূল্যায়নেও ন্যায়পরায়ণতা থাকা উচিত। একজন শিক্ষার্থীর মেধা, পরিশ্রম ও যোগ্যতার ভিত্তিতে মূল্যায়ন হওয়া উচিত, স্কুলের নাম বা মালিকানার ভিত্তিতে নয়।

দেশের আনাচে-কানাচে সব প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত সব শিশুই সমান সম্ভাবনার অধিকারী। রাষ্ট্রের কাজ সেই সম্ভাবনার সিঁড়ি তৈরি করা, ভেঙে দেয়া নয়। সুতরাং সরকারের উচিত চলতি বছরই কিন্ডারগার্টেন স্কুলের শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া। পাশাপাশি আগামী এক বছরের মধ্যে যেসব স্কুল মানদ- পূরণে ব্যর্থ হবে, তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। বৈধ-অবৈধ, যোগ্য-অযোগ্য সব শিক্ষার্থীকে একসঙ্গে বাদ দিয়ে দেয়া কোন বিকল্প নয়, এটি একটি আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। কেননা প্রতিটি সন্তান বা শিশু এই দেশের নাগরিক। তারও অধিকার আছে নিজেকে প্রমাণ করার। তার বিদ্যালয় সরকারি না হোক, শিক্ষা তো সে একই বই থেকেই নিচ্ছে। একজন শিশুর হাতে নেই তার বিদ্যালয় বাছাইয়ের ক্ষমতা, তার অধিকার রয়েছে মেধা ও পরিশ্রমের আলোয় নিজের প্রতিভা প্রদর্শনের। কিন্তু আজকের এই সিদ্ধান্তে শিশুদের শিক্ষার আলোকে ভাগ করা হচ্ছে, যা নৈতিকভাবে অন্যায় এবং শিক্ষাগত অসাম্যের একটি ভয়ংকর নিদর্শন। যদি সেই ভিত্তি বৈষম্য ও অবিচারের দ্বারা টেকসই না হয়, তাহলে দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য শিক্ষার গুণগত মান নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না। এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমাদের আগামীর প্রজন্ম বাধাগ্রস্থ হবে আমাদেরই সন্তান আমাদেরই নাগরিকসত্ত্বা।

বড় দুঃখের বিষয় সচেতন চাকরি প্রত্যাশিত মেধাবী শিক্ষার্থী চাকরি পাওয়ার পরে কর্মস্থলে অবহেলা আর অবজ্ঞার ফল হিসেবে ভালোভাবে পাঠদান না করায় সরকারি বিদ্যালয়মুখী বাচ্চাদের পরিমাণ একদম সীমিত। আর এই কারণে কেজি স্কুলগুলোর উদ্ভব। আর যায় হোক আমরা আশা করি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ দ্রুত পুনর্বিবেচনা করবে এই বিতর্কিত সিদ্ধান্ত। শিক্ষার অধিকার যেন সব শিশুর জন্য সমান ও অন্তর্ভুক্তিমূলক থাকে এটাই আসল শিক্ষা নীতি। এক দেশে দুই শিক্ষা নীতি? না, হবে

একাত্ম শিক্ষা নীতি, যেখানে বিচার হবে শুধু শিক্ষার্থীর মেধা ও যোগ্যতার ভিত্তিতে।

[লেখক : সহকারী শিক্ষক, আমতলী মডেল স্কুল, শিবগঞ্জ, বগুড়া]